বাংলাদেশের ইতিহাস

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্র। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এর কিছু কিছু অংশে মানব বসতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। বেশ প্রাচীন হলেও বাংলাদেশ অংশের জনসমাজ কোন পৃথক সভ্যতার জন্ম দিতে পারেনি। তবে অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সংস্কৃতি হিসেবে টিকে ছিল যুগে যুগে। প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশ প্রাচীন ইতিহাসের কোন পর্যায়েই সম্পূর্ণ স্বাধীন ও একতাবদ্ধভাবে আপন রাষ্ট্র গড়ে তোলার সুযোগ পায় নি। এই সুযোগ তারা লাভ করেছে ১৯৭১ সালে চূড়ান্ত স্বাধীনতার পর। তবে বাংলাদেশের জনসমাজ আবার কখনও কারও সম্পূর্ণ অধীনতাও স্বীকার করে নি। অনেক বিদ্রোহের জন্ম হয়েছে এই অঞ্চলে। দেশটির তিনদিক বর্তমানে ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং এক দিকে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। প্রাগৈতিহাসিক কালে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলই এই বঙ্গোপসাগরের নীচে চাপা পড়ে ছিল। বাংলাদেশের মূল অংশ সাগরের কোল থেকেই জেগে উঠেছে।

প্রাচীন বাংলা

বগুড়ার মহাস্থানগড়ের প্রাচীন বৌদ্ধ পীঠের ধ্বংসস্তুপ

উয়ারি-বটেশ্বর অঞ্চলে ২০০৬ সালে প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুযায়ী বাংলাদেশ অঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠেছিলো প্রায় ৪ হাজার বছর আগে। ধারণা করা হয় দ্রাবিড় ও তিব্বতীয়-বর্মী জনগোষ্ঠী এখানে সেসময় বসতি স্থাপন করেছিল। পরবর্তীতে এই অঞ্চলটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয় এবং স্থানীয় ও বিদেশী শাসকদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে। আর্য জাতির আগমনের পর খ্রিস্টীয় চতুর্থ হতে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত গুপ্ত রাজবংশ বাংলা শাসন করেছিল। এর ঠিক পরেই শশাঙ্ক নামের একজন স্থানীয় রাজা স্বল্প সময়ের জন্য এ এলাকার ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হন। প্রায় একশ বছরের অরাজকতার (যাকে মাৎসন্যায় পর্ব বলে অভিহিত করা হয়) শেষে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজবংশ বাংলার অধিকাংশের অধিকারী হয়, এবং পরবর্তী চারশ বছর ধরে শাসন করে। এর পর হিন্দু ধর্মাবলম্বী সেন রাজবংশ ক্ষমতায় আসে। দ্বাদশ শতকে সুফি ধর্মপ্রচারকদের হাতে বাংলায় ইসলামের প্রবর্তন ঘটে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে সামরিক অভিযান এবং যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে মুসলিম শাসকেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ১২০৫-৬ সালের দিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খীলজী নামের একজন তুর্কী বংশোদ্ভূত সেনাপতি রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে সেন রাজবংশের পতন ঘটান। ষোড়শ শতকে মোঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আসার আগে পর্যন্ত বাংলা স্থানীয় সুলতান ও ভূস্বামীদের হাতে শাসিত হয়। মোঘল বিজয়ের পর ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয় এবং এর নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গীর নগর।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

ঔপনিবেশিক শাসন

বাংলায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের আগমন ঘটে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে। ধীরে ধীরে তাদের প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করে, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের পর কোম্পানির হাত থেকে বাংলার শাসনভার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আসে। ব্রিটিশ রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন একজন ভাইসরয় প্রশাসন পরিচালনা করতেন। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশে বহুবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এর মধ্যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে আনুমানিক ৩০ লাখ লোক মারা যায়।

১৯০৫ হতে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের ফলশ্রুতিতে পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়েছিল, যার রাজধানী ছিল ঢাকায়। তবে কলকাতা-কেন্দ্রিক রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের চরম বিরোধিতার ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায় ১৯১১ সালে। ভারতীয় উপমহাদেশের দেশভাগের সময় ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে আবার বাংলা প্রদেশটিকে ভাগ করা হয়। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ হয়, আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অংশ হয়। ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গের নাম পাল্যটে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়।

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। এটি একটি অতি প্রাচীন শহর। খ্রীষ্টিয় ৭ম শতকেও এর অস্তিত্ব ছিল বলে জানতে পারা যায়। ১৬০৮ সালে ঢাকা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সুবা বাংলার রাজধানীর মর্যাদা পায়। মূলতঃ তখন থেকেই শহর হিসেবে এর প্রসার এবং শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

নামকরণের ইতিহাস

তীরবর্তী এলাকায় ভ্রমণকালে সন্নিহিত জঙ্গলে ঢাকার নামকরণের সঠিক ইতিহাস নিয়ে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। কথিত আছে যে, সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন বুড়িগঙ্গা নদীরহিন্দু দেবী দুর্গার একটি বিগ্রহ খুঁজে পান। দেবী দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ রাজা বল্লাল সেন ঐ এলাকায় একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু দেবীর বিগ্রহ �ঢাকা� বা গুপ্ত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, তাই রাজা মন্দিরের নাম রাখেন ঢাকেশ্বরী মন্দির। মন্দিরের নাম থেকেই কালক্রমে স্থানটির নাম ঢাকা হিসেবে গড়ে ওঠে।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

আবার অনেক ঐতিহাসিকের মতে, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন ঢাকাকে সুবা বাংলার রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন; তখন সুবাদারইসলাম খান আনন্দের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ শহরে �ঢাক� বাজানোর নির্দেশ দেন। এই ঢাক বাজানোর কাহিনী লোকমুখে কিংবদন্তির রূপ নেয় এবং তা থেকেই শহরের নাম ঢাকা হিসেবে গড়ে ওঠে। এখানে উল্লেখ্য যে, মোগল সাম্রাজ্যের বেশ কিছু সময় ঢাকা সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রতি সম্মান জানিয়ে জাহাঙ্গীরনগর নামে পরিচিত ছিল।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য

ধারণা করা হয় কালের পরিক্রমায় ঢাকা প্রথমে সমতট, পরে বঙ্গ ও গৌড় প্রভৃতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রিস্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলমানেরা ঢাকা অধিকার করে। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের ফরমান অনুযায়ী ১৬ জুলাই, ১৬১০সম্রাট জাহাঙ্গীর-এর নাম অনুসারে রাজধানীর নাম জাহাঙ্গীরনগর রাখা হয় | সম্রাট জাহাঙ্গীরের জীবতকাল পর্যন্ত এ নাম বজায় ছিলো । খ্রিষ্টাব্দে ঢাকাকে সুবে বাংলার রাজধানী ঘোষণা করা হয় ।

এর আগে সম্রাট আকবরের আমলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রাদেশিক রাজধানী ছিলো বিহারের রাজমহল । সুবে বাংলায় তখন চলছিলো মোগল বিরোধী স্বাধীন বারো ভূইঁয়াদের রাজত্ব । বারো ভূইয়ার নিয়ন্ত্রন থেকে বাংলাকে করতলগত করতে ১৫৭৬ থেকে ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বার বার চেষ্টা চালানো হয় । এরপর সম্রাট জাহাঙ্গির-এর শাসনামলে ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খান চিশতীকে রাজমহলের সুবেদার নিযুক্ত করেন । তিনি ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে রাজধানী রাজমহল থেকে সরিয়ে ঢাকায় স্থানান্তর করেন ।

সুবেদার ইসলাম খান চিশতী দায়িত্ব নেবার মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে বারো ভূইয়ার পতন ঘটে ও বর্তমান চট্টগ্রামের কিছু অংশ বাদে পুরো সুবে বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের অধিনে আসে ।

১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা সুবে বাংলার রাজধানী হলেও সুবে বাংলার রাজধানী বারবার পরিবর্তন করা হয়েছে । ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে সুবেদার শাহ সুজা রাজধানী আবার রাজমহলে স্থানান্তর করেছিলেন । শাহ সুজার পতনের পর ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে সুবেদার মীর জুমলা আবার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করেন । এরপর বেশ কিছুকাল ঢাকা নির্বিঘ্নে রাজধানীর মর্যাদা ভোগ করার পর ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে সুবেদার মুর্শিদ কুলি খান রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন । এরপর ঢাকায় মোগল শাসনামলে চলতো নায়েবে নাজিমদের শাসন । ব্রিটিশ শাসনের আগে পর্যন্ত এভাবেই চলছিলো । ব্রিটিশরা রাজধানী হিসেবে কলকাতাকে নির্বাচিত করলে ঢাকার গুরুত্ব আবারো কমতে থাকে । এরপর দীর্ঘকাল পর ১৯০৫ সালে ঢাকা আবার তার গুরুত্ব ফিরে পায় । বঙ্গভঙ্গের পর ১৯০৫ সালে ঢাকাকে আসাম ও বাংলার রাজধানী করা হয় । কংগ্রেসের বাধার মুখে ব্রিটিশ রাজ আবার ১৯১১ সালে রাজধানী কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যায় ।

লালবাগের কেল্লা মোগল আমলের একটি স্থাপনা

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

ভূগোল

ভৌগলিক অবস্থানঃ ২৩*৪২' থেকে ২৩*৫৪' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০*২০' থেকে ৯০*২৮' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। ঢাকার চারদিকে নদীপথ দ্বারা বেষ্টিত। ঢাকার উত্তরে রয়েছে টঙ্গী খাল, দক্ষিনে বুড়িগঙ্গা নদী, পূর্বে বালু নদী এবং পশ্চিমে রয়েছে তুরাগ নদী। স্থানিক অবস্থানে ঢাকা মোটামুটিভাবে বাংলাদেশের মাঝখানে অবস্থিত।

আয়তনঃ ৩৬০ বর্গ কিলোমিটার

জনসংখাঃ প্রায় ১ কোটি

আবহাওয়া: মূলতঃ ক্রান্তীয় অঞ্চলের। বছরের বেশীর ভাগ সময়েই উজ্জ্বল সূর্যকিরণ, প্রচন্ড গরম আর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। নভেম্বর হতে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শীতকালের সময়টা বেশ চমৎকার এবং সহনীয়।

বৃষ্টিপাতঃ বাৎসরিক ২৫৪০ মিলি মিটার

বাতাসের আর্দ্রতাঃ আনুমানিক ৮০ শতাংশ

বর্তমান ঢাকা জনগোষ্ঠী

ঢাকা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শহর যা বাঙালি সংস্কৃতির একটি ছবি বলা চলে। ঢাকায় বসবাসকারীদের কিছু অংশের পূর্বপুরুষরা ভারতীয়। তারা অনেকেই ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় ভারত থেকে এসেছিলেন। এদের মধ্যে কিছু বিহারী মুসলমানও ছিল। এদের সংখ্যা বর্তমানে কয়েক লক্ষ। এখানকার বেশির ভাগ লোক মুসলমান সম্প্রদায়ের। কিন্তু সাথে বহু হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম ধর্মানুবলম্বী সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। ঢাকায় বসবাসকারী প্রায় সবাই বাংলা ভাষায় কথা বলে, তবে কিছু লোক ইংরেজী ভাষা এবং উর্দু ভাষা বুঝতে ও বলতে পারে। ঢাকা শহরে অনেক গুলো স্কুল আছে যারা ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। ঢাকার বাসিন্দাদের কিছু অংশ খুব শিক্ষিত এবং আধুনিক।

পুরনো ঢাকার আধিবাসিদের মধ্যে যারা খুবই পুরনো তাদের কুট্টি বলা হয়, তাদের আলাদা উপভাষা এবং সংস্কৃতি রয়েছে। ঢাকা রাজধানী হওয়ায় সারা বাংলাদেশ থেকেই এখানে লোকজন উন্নত জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে আসে।

www.bcsourgoal.com.bd

সংস্কৃতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মূল ধরে তার পার্শ্ববর্তী এলাকা হচ্ছে ঢাকা শহরের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী, চারুকলা ইনস্টিটিউট, কেন্দ্রীয় গণ গ্রন্থাগার ও জাতীয় যাদুঘর এলাকা সংস্কৃতি কর্মীদের চর্চা ও সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর মূল ক্ষেত্র। এর বাইরে বেইলি রোডকে নাটকপাড়া বলা হয় সেখানকার নাট্যমঞ্চগুলোর জন্য। এছাড়াও নবনির্মিত শিল্পকলা একাডেমীর এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল ও অন্যান্য মঞ্চসমূহ নাট্য ও সঙ্গীত উৎসবে সব সময়ই সাংস্কৃতিক চর্চাকে অব্যাহত ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় বছরের বিভিন্ন সময়ে নাট্যোৎসব ও সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের পুরোটা জুড়ে বাংলা একাডেমিতে একুশে বইমেলার আয়োজন করা হয়। বাংলা নববর্ষকে বরণ করতে পহেলা বৈশাখে রমনা পার্কেছায়ানটের অনুষ্ঠান সহ সারাদিন গোটা অঞ্চলে সাংস্কৃতিক উৎসব চলে। সাংস্কৃতিক ঋদ্ধতার ধারাবাহিকতায় সেগুনবাগচার মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরও সারা বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে।

শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় হতেই ঢাকা এই প্রাদেশিক রাজধানীর শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে উঠে। এই সময়ই ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আশির দশক পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এর আশেপাশের এলাকাকে এডুকেশন ডিস্ট্রিক বলা হতো। এই এডুকেশন ডিস্ট্রিকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল, ইডেন কলেজ, ইষ্ট এন্ড হাই স্কুল, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, আজিমপুর গার্লস স্কুল, বেগম বদরুন্নেসা কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও কলেজ, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা আর্ট কলেজ (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনষ্টিটিউট)।

ঐতিহ্যগতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম সৃষ্টি হয়েছিল বৃটিশ শাসনামলে। তখন একে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হতো। বুদ্ধদেব বসুর মতো ছাত্র এবং বিজ্ঞানী সত্যেন বোসের মত শিক্ষক তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামকে উচ্চশিখরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রধানত তিনটি মূল ধারা; এগুলোর প্রথমটি হচ্ছে সরকার নির্ধারিত কারিকুলাম (যা বাংলা অথবা ইংরেজী মিডিয়ামে পড়াশোনা করা যায়), দ্বিতীয়টি হচ্ছে বেসরকারী কেজি লেভেল হতে এ লেভেল পযর্ন্ত ইংরেজী মিডিয়ামের বৃটিশ কারিকুলাম এবং তুতীয়টি হচ্ছে মূলতঃ আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষা নির্ভর মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। মাদ্রাসাভিত্তিক এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন কোনটি সরকার নির্ধারিত কারিকুলাম এবং কোন কোনটি নিজস্ব সৃষ্ট কারিকুলাম ব্যবহার করে শিক্ষা প্রদান করে। শেষোক্ত এ শ্রেনীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর সরকারের কোন প্রশাসনিক

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

নিয়ন্ত্রণ নেই। এই একই চিত্র ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে প্রায় একশভাগ প্রযোজ্য।

বলা বাহুল্য নয় যে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকংশই ঢাকায় অবস্থিত। আশির দশক পর্যন্ত ঢাকা সহ বাংলাদেশে পাবলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই শিক্ষাক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি ছিল। এর পর হতেই বেসরকারি খাতে কিন্ডারগার্টেন ও স্কুলের প্রসার হতে শুরু করে। ১৯৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও ১৯৯৮ সালে তার সংশোধন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে এক বাঁধভাঙ্গা জোয়ার নিয়ে আসে। এযাবত প্রায় ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমিত দিয়েছে সরকার। লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো এর মধ্যে প্রায় ৩০টিই হলো ঢাকায়।

বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বমোট ২১ টি পাবলিক বা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি হচ্ছে ঢাকায়। এগুলো হলোঃ

ঢাকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলোঃ

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (স্থাপিত ১৯২১);

২. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (স্থাপিত ১৯৬২);

৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (স্থাপিত ১৯৯৭);

৪. শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (স্থাপিত ২০০১);

৫. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (স্থাপিত ২০০৫)।

বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বমোট ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ৩০টিই হলো ঢাকায়।

খেলাধুলা

সারা বাংলাদেশের খেলাধুলার কেন্দ্র হচ্ছে ঢাকা ষ্টেডিয়াম (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়াম) ও এর আশেপাশের এলাকা। বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কাবাডি হলেও ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল সহ আরো অনেক খেলা ঢাকায় নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

এক সময় প্রতি বছর ঢাকা ষ্টেডিয়ামে আগা খান গোল্ড কাপ এর মতো আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্ণামেন্ট সারা দেশের মানুষকে উদ্দীপিত করে রাখতো। অল্প কিছু সময় প্রেসিডেন্টস গোল্ড কাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্ণামেন্ট ঢাকা ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়াও ঢাকা ষ্টেডিয়ামে উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক টুর্ণামেন্ট হয়েছিল এশিয়া কাপ, অনুর্ধ ২১ ফুটবল টুর্ণামেন্ট।

বর্তমানে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তায় অন্যান্য খেলাধুলা ম্রিয়মান হয়ে গেছে বলা যায়। স্বাধীনতা পূর্বের ন্যায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়াম পুনরায় আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট ভেন্যু হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়াও মিরপুর জাতীয় ষ্টেডিয়ামও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভেন্যু হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই ষ্টেডিয়ামগুলোতে এখন নিয়মিত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলাসমূহ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

www.bcsourgoal.com.bd

বাংলাদেশের খেলাধুলার সরকারী নিয়ন্ত্রক সংস্থা হচ্ছে জাতীয় ক্রীড়া কাউন্সিল। এর সদর দপ্তর হচ্ছে ঢাকায়। এছাড়াও প্রায় ৩০টি ক্রীড়া ফেডারেশন ঢাকার সদর দপ্তর হতেই জেলা ক্রীড়া সমিতিগুলোর মাধ্যমে সারা দেশের খেলাধুলার কার্যক্রম দেখাশোনা ও পরিচালনা করে। এই ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোর শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন যার সদর দপ্তরও ঢাকায় অবস্থিত। উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া ফেডারেশনগুলো হলোঃ বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন; বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড; বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন; বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন; বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন; বাংলাদেশ শুটিং ফেডারেশন; বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন; বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন; বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন; বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন; বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন; বাংলাদেশ আর্চারী ফেডারেশন; বাংলাদেশ এমেচার এথলেটিক ফেডারেশন; বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশন; বাংলাদেশ তাইকুন্ডু ফেডারেশন। ঢাকার উল্লেখযোগ্য খেলাধুলার কেন্দ্রগুলো হচ্ছে বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়াম এলাকা সংলগ্ন আউটার ষ্টেডিয়াম, ন্যাশনাল সুইমিংপুল, মাওলানা ভাসানী হকি ষ্টেডিয়াম, মোহাম্মদ আলী বক্সিং ষ্টেডিয়াম, উডেনফ্লোর জিমনেশিয়াম, ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি; মিরপুর জাতীয় ষ্টেডিয়াম ও তা সংলগ্ন সুইমিংপুল কমপ্লেক্স; মিরপুর জাতীয় ইনডোর ষ্টেডিয়াম; বনানীর আর্মি ষ্টেডিয়াম ও নৌবাহিনীর সুমিইং কমপ্লেক্স। এছাড়াও ধানমন্ডির আবাহনী ক্লাব মাঠ, ধানমন্ডি ক্লাব মাঠ এবং কলাবাগান ক্লাব মাঠেও সারা বছর ধরে বিভিন্ন লীগ ও টুর্ণামেন্টের খেলা চলে।

ঢাকার দর্শনীয় স্থানসমূহ

ঐতিহাসিক স্থানসমূহঃ

ঢাকেশ্বরী মন্দির, লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল, হোসেনী দালান, ছোট কাটরা, বড় কাটরা, কার্জন হল, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ভবন (পুরাতন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবন), সাত গম্বুজ মসজিদ, তারা মসজিদ, ঢাকা গেইট, পরীবিবির মাজার

ঢাকেশ্বরী মন্দির

ঢাকেশ্বরী মন্দির বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে অবস্থিত একটি মন্দির। এর নামকরণ হয়েছে "ঢাকার ঈশ্বরী" অর্থাৎ ঢাকা শহরের রক্ষাকর্ত্রী দেবী হতে। এই মন্দিরটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

ইতিহাস

ঢাকেশ্বরী মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। ধারণা করা হয় যে, সেন রাজবংশের রাজা বল্লাল সেন ১২শ শতাব্দীতে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তবে সেই সময়কার নির্মাণশৈলীর সাথে এর স্থাপত্যকলার মিল পাওয়া যায় না বলে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন। বিভিন্ন সময়ে এই মন্দিরের গঠন ও স্থাপনার নানা ধরণের পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে।

বর্তমানে এখানে প্রতি বছর ধুমধামের সাথে দূর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

অবস্থান ও স্থাপনাসমূহ

ঢাকেশ্বরী মন্দির ঢাকা শহরের পলাশী ব্যারাক এলাকার নিকটে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস এলাকার দক্ষিণে ঢাকেশ্বরী রোডে অবস্থিত। মূল মন্দির প্রাঙ্গনের বাইরে মহানগর পুজা মন্ডপ অবস্থিত, যেখানে দূর্গা পুজার স্থায়ী বেদী রয়েছে।,

মূল মন্দির এলাকার ভবনগুলি উজ্জ্বল হলুদাভ ও লাল বর্ণের। মূল মন্দির প্রাঙ্গনের উত্তর পশ্চিম কোণে রয়েছে চারটি শিব মন্দির। মূল মন্দিরটি পূর্বাংশে অবস্থিত। এখানে দেবী দূর্গার একটি ধাতু-নির্মিত প্রতিমা রয়েছে।

লালবাগের কেল্লা

মোগল আমলের ঐতিহাসিক নিদর্শন। এটি পুরনো ঢাকার লালবাগে অবস্থিত একটি দূর্গ। সম্রাট আওরঙ্গজেব এর পুত্র আজম ১৬৭৮ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। নবাব শায়েস্তা খানের আমলে এর নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকে, তবে শায়েস্তা খানের কন্যা পরী বিবির মৃত্যুর পর তিনি ১৬৮৪ সালে এর নির্মাণ বন্ধ করে দেন।

কেল্লা এলাকাটিতে নিম্নের তিনটি ভবন রয়েছে -

কেন্দ্রস্থলের দরবার হল ও হাম্মাম খানা

পরীবিবির সমাধি

উত্তর পশ্চিমাংশের শাহী মসজিদ

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

এছাড়া দক্ষিণ-পূর্বাংশে সুদৃশ্য ফটক, এবং দক্ষিণ দেয়ালের ছাদের উপরে বাগান রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই কেল্লা এলাকার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

আহসান মঞ্জিল

পুরনো ঢাকার ইসলামপুরে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি পূর্বে ছিল ঢাকার নবাবদের প্রাসাদ। বর্তমানে এটি জাদুঘর হিসাবে ব্যাবহৃত হচ্ছে। এর প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব আবদুল গনি। তিনি তার পুত্র খাজা আহসানুল্লাহ-র নাম অনুসারে এর নামকরণ করেন। এর নির্মাণকাল ১৮৫৯-১৮৭২ সাল। ১৯০৬ সালে এখানে এক অনুষ্ঠিত বৈঠকে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়।

১৮৯৭ সালে ১২ই জুন ঢাকায় ভূমিকম্প আঘাত হানলে আহসান মঞ্জিলের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। আহসান মঞ্জিলের দক্ষিণের বারান্দাসহ ইসলামপুর রোড সংলগ্ন নহবত খানাটি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। পরবর্তীকালে নবাব আহসানুল্লাহ তা পুনঃনির্মান করেন.

হোসেনী দালান

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের পুরানো ঢাকা এলাকায় অবস্থিত একটি শিয়া উপাসনালয়। এটি মোগল শাসনামলে ১৭শ শতকে নির্মিত হয়। দালানটি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পৌত্র হোসেন (আঃ) এর শাহাদত বরণের স্মরণে নির্মিত। হোসেনী দালানের দক্ষিণাংশে রয়েছে একটি পুকুর। এর উত্তরাংশে শিয়া বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের কবরস্থান অবস্থিত। দালানটি সাদা বর্ণের, এবং এর বহিরাংশে নীল বর্ণের ক্যালিগ্রাফি বা লিপিচিত্রের কারুকাজ রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরেও সুদৃশ্য নকশা বিদ্যমান।

ছোট কাটারা

শায়েস্তা খানের আমলে তৈরি একটি ইমারত। শায়েস্তা খান এটি সরাইখানা বা প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য নির্মান করেছিলেন। আনুমানিক ১৬৬৩ - ১৬৬৪ সালের দিকে এ ইমারতটির নির্মান কাজ শুরু হয় এবং তা ১৬৭১ সালে শেষ হয়েছিল। এটির অবস্থান ছিল বড় কাটারার পূর্বদিকে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে। ইমারতটি দেখতে অনেকটা বড় কাটারার মত হলেও এটি আকৃতিতে বড় কাটারার চেয়ে ছোট এবং এ কারণেই হয়তো এর নাম হয়েছিল ছোট কাটারা। তবে ইংরেজ আমলে এতে বেশ কিছু সংযোজন করা হয়েছিল। ১৮১৬ সালে মিশনারি লিওনার্দ ঢাকার প্রথম ইংরেজী স্কুল।

বর্তমানে ছোট কাটারা বলতে কিছুই বাকি নেই শুধু একটি ভাঙা ইমারত ছাড়া। যা শুধু বিশাল তোড়নের মতন সরু

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

গোলির উপর দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে অসংখ্য দোকান এমন ভাবে ঘিরে ধরেছে যে দেখে বোঝার উপায় নেই যে এখানে মুঘল আমলের এমন একটি স্থাপত্য ছিল।

বড় কাটরা

ঢাকায় অবস্থিত মুঘল আমলের নিদর্শন। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজার নির্দেশে ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে (হিজরী ১০৫৫) বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে এই ইমারতটি নির্মাণ করা হয়। এর নির্মাণ করেন আবুল কাসেম যিনি মীর-ই-ইমারত নামে পরিচিত ছিলেন। প্রথমে এতে শাহ সুজার বসবাস করার কথা থাকলেও পরে এটি মুসাফিরখানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এক সময় স্থাপত্য সৌন্দর্যের কারনে বড় কাটরার সুনাম থাকলেও বর্তমানে এর ফটকটি ভগ্নাবশেষ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। এক সময় বড় কাটরার তোরণে ফারসি ভাষায় শাদুদ্দিন মুহম্মদ সিরাজী লিখিত একটি পাথরের ফলক লাগানো ছিল। যেখানে এই মুসাফির খানার নির্মাতা ও এর রক্ষনাবেক্ষনের ব্যয় নির্বাহের উপায় সম্পর্কে জানা যায়। ফলকে লেখা ছিল:

সুলতান শাহ্‌ সুজা সব সময় দান-খয়রাতে মশগুল থাকিতেন। তাই খোদার করুণালাভের আশায় আবুল কাসেম তুব্বা হোসায়নি সৌভাগ্যসূচক এই দালানটি নির্মাণ করিলেন। ইহার সঙ্গে ২২টি দোকানঘর যুক্ত হইল- যাহাতে এইগুলির আয়ে ইহার মেরামতকার্য চলিতে পারে এবং ইহাতে মুসাফিরদের বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা হইতে পারে। এই বিধি কখনো বাতিল করা যাইবে না। বাতিল করিলে অপ্রাধী শেষ বিচার দিনে শাস্তি লাভ করিবে। শাদুদ্দিন মুহম্মদ সিরাজি কর্তৃক এই ফলকটি লিখিত হইল।

কার্জন হল

কার্জন হল - মূল ভবন,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের অন্যতম প্রধান ভবন। বহু ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে আজও মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে দ্বি-তল বিশিষ্ট লাল ইটের তৈরি এই ভবনটি

কার্জন হল

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে অবস্থিত একটি ভবন, যা পুরাকীর্তি হিসেবে স্বীকৃত। এটি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান অণুষদের কিছু শ্রেনীকক্ষ ও পরিক্ষার হল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

www.bcsourgoal.com.bd

ইতিহাস

ফেব্রুয়ারি ১৯, ১৯০৪ সালে ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল - জর্জ কার্জন এর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত একটি সরকারী মেডিকেল কলেজ। এটি ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যা বর্তমানে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে ৫ বছর মেয়াদি এমবিবিএস কোর্সে প্রতি বছর ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ভবন নগরীর কেন্দ্রস্থলে শহীদ মিনার ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে অবস্থিত।

সাতগম্বুজ মসজিদ

ঢাকার মোহাম্মদপুর থানার জাফরাবাদ এলাকায় অবস্থিত। এই মসজিদটি চারটি মিনারসহ সাতটি গম্বুজের কারনে মসজিদের নাম হয়েছে 'সাতগম্বুজ মসজিদ'। এটি মোগল আমলের অন্যতম নিদর্শন। ১৬৮০ সালে মোগল সুবাদার শায়েস্তা খাঁর আমলে তার পুত্র উমিদ খাঁ মসজিদটি নির্মান করান।

তারা মসজিদ

পুরানো ঢাকার আরমানিটোলায় আবুল খয়রাত সড়কে অবস্থিত। সাদা মার্বেলের গম্বুজের ওপর নীলরঙা তারায় খচিত এ মসজিদ নির্মিত হয় আঠারো শতকের প্রথম দিকে। মসজিদের গায়ে এর নির্মাণ-তারিখ খোদাই করা ছিল না। জানা যায়, আঠারো শতকে ঢাকার 'মহল্লা আলে আবু সাঈয়ীদ'-এ (পরে যার নাম আরমানিটোলা হয়) আসেন জমিদার মির্জা গোলাম পীর। ঢাকার ধণাঢ্য ব্যক্তি মীর আবু সাঈয়ীদের নাতি ছিলেন তিনি। মির্জা গোলাম পীর এ মসজিদ নির্মাণ করেন। ịমির্জা সাহেবের মসজিদ হিসেবে এটি তখন বেশ পরিচিতি পায়। ১৮৬০ সালে মারা যান মির্জা গোলাম পীর। পরে, ১৯২৬ সালে, ঢাকার তৎকালীন স্থানীয় ব্যবসায়ী, আলী জান বেপারী মসজিদটির সংস্কার করেন। সে সময় জাপানের রঙিন চিনি-টিকরি পদার্থ ব্যবহৃত হয় মসজিদটির মোজাইক কারুকাজে।

মোঘল স্থাপত্য শৈলীর প্রভাব রয়েছে এ মসজিদে। ঢাকার কসাইটুলীর মসজিদেও এ ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, দিল্লি, আগ্রা ও লাহোরের সতের শতকে নির্মিত স্থাপত্যকর্মের ছাপ পড়ে মোঘল স্থাপত্য শৈলীতে।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

মির্জা গোলামের সময় মসজিদটি ছিল তিন গম্বুজঅলা, দৈর্ঘ্যে ৩৩ ফুট (১০.০৬ মিটার) আর প্রস্থে ১২ ফুট (৪.০৪ মিটার)। আলী জানের সংস্কারের সময়, ১৯২৬ সালে, মসজিদের পূর্ব দিকে একটি বারান্দা বাড়ানো হয়। ১৯৮৭ সালে তিন গম্বুজ থেকে পাঁচ গম্বুজ করা হয়। পুরনো একটি মেহরাব ভেঙে দুটো গম্বুজ আর তিনটি নতুন মেহরাব বানানো হয়। মসজিদের বর্তমান দৈর্ঘ্য ৭০ ফুট (২১.৩৪ মিটার), প্রস্থ ২৬ ফুট (৭.৯৮ মিটার)।

পার্ক , বিনোদন ও প্রাকৃতিক স্থানঃ

রমনা পার্ক, সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ঢাকা শিশু পার্ক, বুড়িগঙ্গা নদী, ঢাকা চিড়িয়াখানা, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর

রমনা পার্ক

ঢাকা শহরের রমনা এলাকায় অবস্থিত একটি উদ্যান। এখানে প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ এর অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই উদ্যানটি ১৬১০ সালে মোগল আমলে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯ শতকে ব্রিটিশ শাসক এবং ঢাকার নবাবদের সহায়তায় এটির উন্নয়ন সাধন করা হয়।

বুড়িগঙ্গা নদী

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে অবস্থিত দেশের প্রধান যাদুঘর। এটি মার্চ ২০, ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং আগস্ট ৭, ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর ১৭ তারিখ এটিকে জাতীয় জাদুঘরের মর্যাদা দেয়া হয়।

জাদুঘরটি শাহবাগের মোড়ের সন্নিকটে পিজি হাসপাতাল, রমনা পার্ক ও চারুকলা ইন্সটিটিউটের পাশে অবস্থিত। এখানে নৃতত্ব, চারুকলা, ইতিহাস, প্রকৃতি এবং আধুনিক ও বিশ্ব-সভ্যতা- ইত্যাদি বিষয়ে আলাদা প্রদর্শনী রয়েছে। এ ছাড়া এখানে একটি সংরক্ষণাগারও রয়েছে।

জাতীয় জাদুঘরের বিভাগগুলো হচ্ছে:

www.bcsourgoal.com.bd

ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা

জাতিতত্ত্ব ও অলঙ্করণ শিল্পকলা

সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা

প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগ

সংরক্ষণ গবেষণাগার

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক দেশের প্রথম জাদুঘর। এটি ঢাকার ৫নং সেগুনবাগিচায় অবস্থিত। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরের উদ্বোধন হয় ১৯৯৬ সালের ২২ শে মার্চ। মুক্তিযুদ্ধের অনেক দুর্লভ বস্তু আছে এই জাদুঘরে ।

স্মৃতিসৌধ ও স্মারকঃ

জাতীয় শহীদ মিনার, শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, (রায়ের বাজার), অপরাজেয় বাংলা-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আসাদ গেইট

শহীদ মিনার

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিসৌধ। এটি ঢাকার কেন্দ্রস্থলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে অবস্থিত।

অপরাজেয় বাংলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে অবস্থিত একটি ভাস্কর্য। এটি নির্মাণ করেন মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মরণে নিবেদিত, এবং তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে চিত্রায়িত করেছে। ১৯৭৩ সালে ভাস্কর্যটি তৈরি করা শুরু হয়। এর কাজ শেষ হয় ১৯৭৯ সালে। ৬ ফুট বেদীর উপর নির্মিত এর উচচতা ১২ ফুট, প্রস্থ ৮ ফুট ও ব্যাস ৬ ফুট।

আধুনিক স্থাপত্যঃ

জাতীয় সংসদ ভবন, বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন, ভাসানী নভোথিয়েটার, বসুন্ধরা সিটি

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

জাতীয় সংসদ ভবন

বাংলাদেশ এর জাতীয় সংসদ এর প্রধান ভবন। এটি ঢাকার শেরে-বাংলা নগর এলাকায় অবস্থিত। প্রখ্যাত মার্কিন স্থপতি লুই আই.কান এটির মূল স্থপতি।

ইতিহাস

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আটটি সংসদ নির্বাচনের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় নির্বাচনের পর গঠিত সংসদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় পুরনো সংসদ ভবনে, যা প্রধান মন্ত্রীর (বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টা) কার্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তানের (বর্তমান পাকিস্তান) জন্য আইনসভার জন্য জাতীয় সংসদ ভবনের নির্মাণ শুরু হয় ১৯৬১ সালে। ১৯৮২ সালের ২৮শে জানুয়ারি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর একই বছরের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদের অষ্টম (এবং শেষ) অধিবেশনে প্রথম সংসদ ভবন ব্যবহৃত হয়। তখন থেকেই আইন প্রনয়ন এবং সরকারি কর্মকান্ড পরিচালনার মূল কেন্দ্র হিসাবে এই ভবন ব্যবহার হয়ে আসছে।

তথ্য

নির্মানকার্য সূচনা: ১৯৬১

নকশা ও নির্মান ব্যয়: ১২৯ কোটি টাকা

উদ্বোধন: ২৮শে জানুয়ারি, ১৯৮২

স্থপতি: লুইস কান

মোট এলাকা: ২০০ একর (৮,০০,০০০ m�)

অবস্থান: শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা

মোট সংসদের সংখ্যা: ৭

সংসদীয় ইতিহাস

বাংলাদেশে গঠিত সকল সংসদের তালিকা:

১) প্রথম সংসদ: ২ বছর ৬ মাস (৭ই এপ্রিল, ১৯৭৩ - ৬ই নভেম্বর, ১৯৭৫) আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে

২) দ্বিতীয় সংসদ: ২ বছর ১১ মাস (২রা এপ্রিল, ১৯৭৯ - ২৪শে মার্চ, ১৯৮২) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বে

৩) তৃতীয় সংসদ: ১ বছর ৫ মাস (১০ই জুলাই, ১৯৮৬ - ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৭) জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে

৪) চতুর্থ সংসদ: ২ বছর ৭ মাস (১৫ই এপ্রিল, ১৯৮৮ - ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯০) জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে

৫) পঞ্চম সংসদ: ৪ বছর ৮ মাস (৫ই এপ্রিল, ১৯৯১ - ২৪শে নভেম্বর, ১৯৯৫) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বে

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

৬) ষষ্ঠ সংসদ: ১২ দিন (১৯শে মার্চ, ১৯৯৬ - ৩০শে মার্চ, ১৯৯৬) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বে

৭) সপ্তম সংসদ: ৫ বছর (১৪ই জুলাই, ১৯৯৬ - ১৩ই জুলাই, ২০০১) আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে

৮) অষ্টম সংসদ: (২৮শে অক্টোবর, ২০০১ - ২৭শে অক্টোবর, ২০০৬) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোটের নেতৃত্বে

এর মধ্যে প্রথম সংসদ কখনোই জাতীয় সংসদ ভবন ব্যবহার করেনি। প্রতিটি সংসদের নেতা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

স্থাপত্যশৈলী ও নকশা

লুই কান কমপ্লেক্সের অবশিষ্ট অংশের ডিজাইন করেন। জাতীয় সংসদ ভবন জাতীয় সংসদ কমপ্লেক্সের একটি অংশ। কমপ্লেক্সের মধ্যে আরো আছে সু দৃশ্য বাগান, কৃত্রিম হ্রদ এবং সংসদ সদস্যদের আবাসস্থল।

অবস্থান

ঢাকার শের-এ-বাংলা নগরে অবস্থিত জাতীয় সংসদ কমপ্লেক্সকে ঘিরে রয়েছে চারটি প্রধান সড়ক:

উত্তর দিকে লেক রোড;

পূর্ব দিকে রোকেয়া সরণী;

দক্ষিণ দিকে মানিক মিয়া এভিনিউ; এবং

পশ্চিম দিকে মিরপুর রোড;

ফলে সংসদ অধিবেশন চলাকালে যানবাহন চলাচল ও সহজে চলাচল নিয়ন্ত্রন করা সম্ভবপর হয়। মূল ভবনটি (সংসদ ভবন) মূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত:

মেইন প্লাজা (The Main Plaza): ৮২৩,০০০ বর্গফুট (৭৬,০০০ বর্গমিটার)

সাউথ প্লাজা (South Plaza): ২২৩,০০০ বর্গফুট (২১,০০০ বর্গমিটার)

প্রেসিডেন্সিয়াল প্লাজা (Presidential Plaza): ৬৫,০০০ বর্গফুট (৬,০০০ বর্গমিটার)

মূল ভবনটি কমপ্লেক্সের কেন্দ্রে অবস্থিত। এমপি হোস্টেল এবং জরুরী কাজে ব্যবহৃত ভবনসমূহ কমপ্লেক্সের বহির্ভাগে অবস্থিত। মূল ভবন ঘিরে অবস্থিত কৃত্রিম হ্রদ, দুটি বাগান এর মাঝের শূণ্যস্থান পূরণ করেছে।

স্থাপত্য দর্শন

এই স্থাপনার স্থাপত্য দর্শনের মূলে ছিল স্থানের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং স্থাপত্যশৈলীর মাধ্যমে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তোলা। প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে স্থাপত্যশৈলী দ্বারা।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

মূল ভবনের নকশা

মূল ভবনটি নয়টি পৃথক ব্লক দিয়ে তৈরী: মাঝের অষ্টভূজ ব্লকটির উচ্চতা ১৫৫ ফুট এবং বাকি আটটি ব্লকের উচ্চতা ১১০ ফুট। প্রতিটি ব্লকের জায়গাকে বিভিন্ন কাজের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে, করিডোর, লিফট, সিড়ি ও বৃত্তাকার পথ দিয়ে আনুভূমিক ও উলম্বিকভাবে ব্লকগুলোর মাঝে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। পুরো ভবনটির নকশা এমনভাবে প্রনয়ন করা হয়েছে যাতে সব ব্লকগুলোর সমন্বয়ে একটি ব্লকের অভিন্ন স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

দ্বিতীয় তলার একটি লাগোয়া ব্লকে প্রধান কমিটির রুমগুলো রয়েছে। সকল ধরনের সংসদীয় কার্যক্রম, মন্ত্রী, চেয়ারপারসন এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির অফিস রয়েছে এই ভবনে। একই ভবনে সংসদীয় সচিবের জন্যও কিছু অফিস বরাদ্দ রয়েছে।

মেইন প্লাজা

মেইন প্লাজার মূল অংশটি হচ্ছে সংসদ অধিবেশন কক্ষ। এখানে একই সময়ে ৩৫৪ জন সদস্যের সংস্থান রাখা হয়েছে। ভিআইপিদের জন্য দুইটি পোডিয়াম এবং দুইটি গ্যালারী রয়েছে। পরাবৃত্তাকার ছাদসম্পন্ন অধিবেশন কক্ষটির উচ্চতা ১১৭ ফুট। ছাদটি স্বচ্ছভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে দিনের আলো এতে প্রবেশ করতে পারে। সূর্যের আলো চারদিকের ঘেরা দেয়াল ও অষ্টভূজকৃতির ড্রামে (Drum) প্রতিফলিত হয়ে অধিবেশন কক্ষ প্রবেশ করে। (আলোর নান্দনিকতা ও সর্বোচ্চ ব্যবহার লুই কানের স্থাপত্য ক্ষমতার নিদর্শন স্বরূপ।)

কৃত্রিম আলোকে এমনভাবে বিভক্ত করা হয়েছে যে সূর্যের আলোর প্রবেশের ক্ষেত্রে তা কোনো বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। শ্যান্ডেলির (Chandelier) বা ঝাড়বাতিগুলো পরাবৃত্তাকার ছাদ হতে নিচে নেমে এসেছে। এর গঠনশৈলীতে ধাতুর ব্যবহার প্রতিটি আলোক উৎসর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

উপরের অংশের অভ্যাগত এবং গণমাধ্যমের জন্য গ্যালারীর ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও এর বিভিন্ন অংশে রয়েছে:

প্রথম তলায়, একটি গ্রন্থাগার;

তৃতীয় তলায়, সংসদ সদস্যদের জন্য লাউঞ্জ; এবং

উপর তলায়, মিলনায়তন;

সাউথ প্লাজা

দক্ষিণ দিকে মানিক মিয়া এভিনিউর অভিমুখে সংসদ ভবনের সাউথ প্লাজা অবস্থিত। এর ক্রমোচ্চ (Gradually rises) ২০' উচ্চতার ভবন কাঠামো সৌনর্য বর্ধনের পাশপাশি সংসদ ভবনের মূল প্রবেশ পথ (অধিবেশন চলাকালে) হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে আরো রয়েছে:

www.bcsourgoal.com.bd

নিয়ন্ত্রিত প্রবেশপথ;

ড্রাইভওয়ে;

প্রধান যন্ত্রপ্রকৌশল কক্ষ;

গাড়ি পার্কিং-এর জন্য বিস্তৃত পরিসর;

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ;

রক্ষনাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত প্রকৌশলীদের অফিসকক্ষ;

উপকরণ সরঞ্জাম রাখার স্থান; এবং

মূল ভবনে যাওয়ার জন্য উন্মুক্ত চত্বর;

প্রেসিডেন্সিয়াল প্লাজা

উত্তর দিকে অবস্থিত প্রেসিডেন্সিয়াল প্লাজা সম্মুখে লেক রোড অবস্থিত। এই প্লাজা সংসদ সদস্য এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মার্বেলের তৈরি মেঝে, গ্যালারী এবং খোলা পথ এই প্লাজার নির্মাণশৈলীর বৈশিষ্ট্য।

বাংলা ভাষা

বাংলা দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বপ্রান্তের একটি ইন্দো-আর্য ভাষা। সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে।

বাংলা দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বে অবস্থিত বঙ্গ বা বাংলা নামক অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা। এ অঞ্চলটি বর্তমানে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও ভারতের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে গঠিত। প্রায় ২০ কোটি মানুষের মাতৃভাষা বাংলা বিশ্বের বহুল প্রচলিত ভাষাগুলোর মধ্যে একটি (ভাষাভাষীর সংখ্যানুসারে এর অবস্থান চতুর্থ থেকে সপ্তমের মধ্যে। বাংলা বাংলাদেশের প্রধান ভাষা; ভারতে বাংলা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কথিত ভাষা। অসমীয়া ও বাংলা ভৌগলিকভাবে সবচেয়ে পূর্বে অবস্থিত ইন্দো-ইরানীয় ভাষা।

www.bcsourgoal.com.bd